International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-X, Issue-V, September 2024, Page No.90-100
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.vol.10.issue.05W.010

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের ঈশ্বরভাবনামূলক কবিতা : বিষয়ে ও শৈলীভাবনার নিরিখে

দেবপ্রসাদ গোস্বামী
সরকার অনুমোদিত কলেজ শিক্ষক, বাংলা বিভাগ, কাটোয়া কলেজ , কাটোয়া, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:

Achintyakumar Sengupta was one of the foremost poets of the Kallol era. We know that in the context of Bengali poetry in the 30s and 40s of the 20th Century, one of the few magazines around which modernity began is 'Kallol'. Kallol is not just a magazine, Kallol is an era. In every poet of this era there was a frenzy of rebellion, creating sparks of protest and resistance and channeling it into poetry and literature. Achintyakumar Sengupta took that path in his early life as a poet. But after the Second World War, the spark of rebellion is not seen in his poems written in the period after 1950 AD, where the themes of ultimate Godism and devotionalism become prominent. In other words, his poetry eventually became spiritual.

As a marginal poet of Bengali literature, Achintyakumar Sengupta has remained forever unknown. Judging by the style of his various ideologies and devotional poems, it is shown how the Rati which prevailed in the romanticism of his paintings, finally reached the Aarti. Sri Sri Tagore's closeness to Ramakrishna further expanded his devotional consciousness. In the early stages of his poetry, the idea of God was hidden in the form of a seed, and in the latter, the spiritual sap grew in his poetry.

By judging the style of his various poems, we have seen that the more God-oriented he became, the more his poetic theory became impregnated with devotion, spiritual juice. This is how the poetic style of his God-contemplative poems was created. In order to get rid of the circle of crisis of an age, he tried to present a devotional speech in poetry. This attempt removed him from the Kallol group and he became a traveler on a lonely path. In that way Achintyakumar's biography has been transformed into Bhakti.

Key words: অচিন্ত্যকুমার, শৈলীভাবনা, প্রমুখন, বিচ্যুতি, কাব্যশৈলী, আধ্যাত্মিকতা, কল্লোল, ঈশ্বরভাবনা।

> ‘কবির আর এক অর্থ সবিতা। জনয়িতা, রচয়িতা। যার থেকে সমস্ত কিছুর জন্ম। সমস্ত কিছুর যাত্রা। সমস্ত কিছুর ভূমিকা। আদি কবি ঈশ্বর।’ [১]

এভাবেই অচিন্ত্যকুমার কবিতাকে দেখতে চেয়েছিলেন এবং পাশাপাশি কবিকেও। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই তাঁর রচিত কবিতায় প্রেম, বিদ্রোহ এসব বিষয়গুলি ক্রমশ প্রচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। তিনি আধ্যাত্ম পিপাসায় অধীর হয়ে ওঠেন। যে কবির কবিত্বের সূচনা বিদ্রোহের প্রেক্ষাপটে, সেই কবি পৌঢ়ত্বের কালে এসে পৌঁছলেন চূড়ান্ত ভক্তিবাদে। প্রকৃতপক্ষে বলা যায় ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দের পর তাঁর সাহিত্যকৃতিতে মূলত ঈশ্বরভাবনা এবং আধ্যাত্মপ্রীতির জোয়ার লক্ষ্য করা যায়। এই সময়পর্বে লেখা একটি জীবনীগ্রন্থে তিনি সাহিত্যকে বিশ্লেষণ করলেন এভাবে—

> 'এই বিশ্বসৃষ্টিটা মানুষের কাছে লেখা ঈশ্বরের একটা প্রেমপত্র। আর মানুষের সাহিত্য হচ্ছে তার প্রত্যুত্তর। এই বিশ্বসৃষ্টি হচ্ছে ঈশ্বরের সুর সম্ভাষণ, সাহিত্য হচ্ছে তার প্রতিধ্বনি। এই বিশ্বসৃষ্টি হচ্ছে ঈশ্বরের কান্তিগৌরব, সাহিত্য হচ্ছে তার প্রতিধ্বনি। এই বিশ্বসৃষ্টি হচ্ছে ঈশ্বরের কান্তি গৌরব, সাহিত্য হচ্ছে তার প্রতিচ্ছায়া।' (২)

মূলত রোমান্টিক কবি হিসেবে যাঁর আবির্ভাব, কাব্যরচনার উত্তরকালে তাঁর মনোগতি ও জীবনগতি এবং কাব্যগতির এই আমূল পরিবর্তন তাঁর সমগ্র কাব্যাদর্শের মূল ভিত্তিকে পরিবর্তিত করে দিয়েছিল। আমরা মনে করি রোম্যান্টিকতা ও বিদ্রোহের চরম শিখরে অবস্থানের মধ্য দিয়ে যাঁর আবির্ভাব, তাঁর মনের মধ্যে এই ভক্তিবাদ গহন-গভীরে বীজ আকারে লুকিয়ে ছিল। যা তাঁর কাব্যজীবনের শেষ দিকে জীবনবোধের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে মিশে গেছে। বলেছেন—

> 'এ যুগ নাস্তিকতার যুগ। শুধু যুগধর্ম নয়,— এ যুগের বাতাস নাস্তিকতার কোণ থেকে প্রবাহিত, এ যুগের ধ্বনি নাস্তিকতার জয়ধ্বনির প্রতিধ্বনি। এ যুগেও অচিন্ত্যবাবুর এই জীবন মাহাত্ম্য জীবন তপস্যার স্বরূপকে মিথ্যা মনে করেন নি; ভারতবর্ষে বিশেষ করে, ঋষিত্বের বা সাধুত্বের তপস্যার প্রতি একটা জন্মগত প্রবণতা আছে তাকে ক্ষুদ্র মনে করেন নি, অবজ্ঞা করেন নি। এখানেই অচিন্ত্যবাবুর চিত্তে আকাশের জ্যোতির্লোক প্রতিফলিত হয়েছে,— এ প্রতিফলন অসাধারণভাবে সার্থক। বুদ্ধিসর্বস্বতা ও নাস্তিকতার যুগে যখন টেবিলে বিলাতী খানা এবং কাঁটা চামচের সমারোহে পানীয় উত্তেজনা তখন তিনি মেঝের ওপর আসন পেতে থালা গেলাসে অন্নব্যঞ্জনের ব্যবস্থা করেছেন'(৩)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে যখন অন্যান্য সাহিত্যিকরা বাস্তব পটভূমিকার ছবি আঁকতে ব্যস্ত। তাঁদের কবিতায় যখন প্রতিফলিত হচ্ছে সমসময়ের অন্ধকারের তথা নিরর্থকতার চিহ্ন, তখন সেই সময়ের কবি হয়েও অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত 'কল্লোলে'র সেই মানসিকতা থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলেন। বদলে নিলেন নিজের পথকে। তিনি উপলব্ধি করলেন পৌঁছাতে হবে শিকড়ে। ভারতবর্ষের প্রাচীন ঐতিহ্যের কাছাকাছি। হাঁটতে শুরু করলেন জীবনের মূলাঙ্কের পথে।

মনে রাখতে হবে এই কবি যে পথের সন্ধানে বেরিয়ে ছিলেন চরম রোমান্টিকতার দেহজ প্রেমের জগতে, তিনি উপলব্ধি করলেন ভারতীয় ঐতিহ্য এই পথে তৈরি হয়নি। আবার এই পথে সম্পূর্ণও নয়। তাই তিনি বেছে নিলেন ঈশ্বর বিশ্বাসের পথ। এই মাহেন্দ্রক্ষণে শ্রী শ্রী ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের ভাবাদর্শের সান্নিধ্য তাঁর চিন্তা-চেতনার আগুনে যেন ঘৃতাহুতি দান করল। সাহিত্য সৃষ্টির গোড়া থেকেই যে ভাবনা বীজ আকারে কবির মনে লুকিয়ে ছিল গভীর অন্ধকারে, তার অঙ্কুরোদগম ঘটল এই পর্বে। যেখানে ঈশ্বরভাবনা গোপনে বীজ আকারে লুকিয়ে ছিল, তা বৃক্ষরূপে এবং আরো পরে তা মহীরূহে পরিণত

হয়েছে। 'তারপরে যখন তিনি পৌঢ়ত্বের দিকে পা বাড়িয়েছেন তখন আরেক জন মহাপুরুষের প্রভাবাধীন তিনি হলেন। বলা অনাবশ্যক যে তিনি ঠাকুর রামকৃষ্ণ। আজকের দিনের পাঠক হয়তো কল্লোল যুগের অচিন্ত্যকুমারকে ভুলেছে। তারা যে অচিন্ত্যকুমারকে জানে সে ঠাকুর রামকৃষ্ণের হাতে গড়া লেখক, সেই সঙ্গে বলা উচিত হাতে গড়া মানুষ। সেদিনকার অচিন্ত্যকুমারের পরিচিতি ব্যক্তি আজকার অচিন্ত্যকুমারকে কতটা চিনতে পারবেন জানি না, চিনতে না পারলে বিস্মিত হওয়ার কারণ নেই। দুই ঠাকুরের প্রভাবে তিনি মানুষ, এক মেটে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দুই মেটে দিয়েছেন ঠাকুর রামকৃষ্ণ, দুই মেটের তলায় এক মেটে বহুল পরিমাণে প্রচ্ছন্ন।'[৪]

তাঁর কবিজীবনের প্রথম কাব্য সংকলন হলো 'অমাবস্যা'। আমরা পূর্বের আলোচনায় পেয়েছি প্রথম দিকে তাঁর কাব্যে ঈশ্বরভাবনা বীজ আকারে লুকিয়ে ছিল। এই কাব্যের মূল বিষয় প্রেম। কিন্তু তিনি প্রেমেরও ফাঁকে ফাঁকে শোনালেন ঈশ্বরচেতনার কথা। এখন আমরা কবিতাটির শৈলীভাবনার মধ্য দিয়ে দেখব কিভাবে কবিতাটিতে আধ্যাত্মিক রস বড় হয়ে উঠেছে।

এই কবিতায় কবি বিশ্বের সমস্ত কিছুকে উপলব্ধি করে আনন্দে গান গাওয়ার কথা বলেছেন। 'আনন্দের গান' এই রূপকে কবি বিশ্বের অমৃতরস পান করতে চেয়েছেন। বস্তুজগত থেকে পাওয়া অনুভূতিকে দেখতে চেয়েছেন বস্তুজগত থেকে সরে গিয়ে। এই কবিতার স্তবক সংখ্যা ছয়টি। প্রথম স্তবকের পংক্তি সংখ্যা মাত্র দুই। সমগ্র কবিতা জুড়ে অসম দৈর্ঘ্যের পংক্তিবিন্যাস কবিতায় একটা গতিময়তার সৃষ্টি করেছে। এই কবিতার পঁচিশটি পংক্তিতে 'যে আনন্দে' এই গঠন ধ্রুবপদের মতো ব্যবহৃত হয়েছে। একে বাক্যাংশের পুনরুক্তি বলে। এই পুনরুক্তির পর বিভিন্ন পংক্তিতে বিভিন্ন বিষয়গুলি স্থান পেয়েছে। ব্যাকরণের দৃষ্টিতে এই পুনরুক্তিকে 'বাক্যাংশগত পুনরুক্তি' বলা হয়।

আমাদের মনের একটি নির্দিষ্ট ভাবকে জ্ঞাপন করতে একই বাক্যের বারবার ব্যবহার সাধারণত আমরা করি না। আর যদি করে থাকি, তাহলে তা কথকের জ্ঞাপনের ভাবের উপর আরোপিত হয় তার নির্দিষ্ট মনোভাব। এ কবিতায় একই শব্দ বা বাক্যাংশ একাধিকবার ব্যবহৃত হয়ে যে পুনরুক্তির গঠন তৈরি করেছে, সেখানে কবির আলাদা আলাদা মনোভঙ্গির প্রকাশ ফুটে উঠেছে। যেমন-

১) 'যে আনন্দে বুকে বাজে নব নব দেবতার পদনৃত্য ধ্বনি'
২) 'যে আনন্দে ঝটিকার নগ্ন অভিসার।'
৩) 'যে আনন্দে ঋতুতে ঋতুতে এত অজস্রের বর্ণ বিলাসিতা'
৪) 'যে আনন্দে ভিখারিণী আপনারে নগ্ন করি দিয়াছিল চীর।'
৫) ''যে আনন্দে বৃদ্ধ পিতা করেছিল ভিক্ষা, তার সন্তানের প্রফুল্ল যৌবন'

এভাবে বিভিন্ন বাক্যে প্রতিটি পুনরুক্তি কবিতায় স্বতন্ত্র তাৎপর্যে প্রতিষ্ঠিত। পুনরুক্তি সম্পর্কে সমালোচক শিশির কুমার দাশ বলছেন—

> 'বারবার এক শব্দের বা এক ধরনের শব্দের ব্যবহারের মধ্যে লেখকের একটি অভিপ্রায় নিহিত থাকা স্বাভাবিক। এরকম ব্যবহার যদি এক-আধবার হত, তাহলে এদের খুব গুরুত্ব না দিলেও চলত, এদের আকস্মিক হিসেবে গণ্য করা যেত। কিন্তু যদি দেখা যায় কোন লেখকের এইরকম

ব্যবহারের প্রবণতা আছে, এবং তার লেখায় এই ধরনের প্রয়োগ প্রচুর তখন তাকে আকস্মিক বলা ঠিক হবে না' (৫)

এই বাক্যাংশগত পুনরুক্তি এখানে একটা অবিশ্বাস্য ভাবকে ক্রমশ বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছে। বস্তুত কবি যখন মনে করেন কোন শব্দ বা শব্দগুচ্ছের একক ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠকের সঙ্গে তিনি পুরোপুরি কমিউনিকেট করতে পারছেন না, তখনই তিনি পুনরুক্তির আশ্রয় নেন। এখানে সেই চিন্তাভাবনার প্রকাশ ঘটানোর জন্যই এই ধরণের শৈলীর প্রয়োগ দেখা গিয়েছিল। ঈশ্বরবিশ্বাস হলো চূড়ান্ত ভক্তিবাদের বিষয়। মানুষের সহজ উপলব্ধির স্তরে সেই আধ্যাত্মবোধকে নিয়ে আসার জন্যই এ কবিতায় বাক্যাংশের পুনরুক্তি এত বহুল পরিমাণে দেখা গেছে। এই পুনরুক্তি আবার কবিতার নামকরণকে Emphasis করেছে। এ কবিতার শৈলীভাবনা আধ্যাত্ম্যবাদকে ধারণ করে আছে শরীরে। একস্থানে কবি বলেছেন,-

'যে আনন্দে সন্ন্যাসীরা দেহ হতে জীর্ণ বস্ত্র ফেলে দেয় টানি
স্কন্ধে বহে বৈরাগ্যের একতারাখানি।'

এই পঙক্তির ভাব আমাদেরকে টেনে নিয়ে যায় সনাতন ভারতবর্ষের ঐতিহ্যের দিকে। যেখানে বদলে যাচ্ছে জীবন প্রত্যয়ের অভিমুখ, কবি শেষ ইচ্ছা পূরণ করতে চাইছেন বৈরাগ্যসাধনে। এই দুয়ের সংসার মোহ ত্যাগ করে, তিনি 'একতারা'কে সঙ্গী করে 'একে' মিলিত হতে চেয়েছেন এবং সেজন্যই এই 'একতারা' নামক চিত্রকল্পের আয়োজন। গড়ে ওঠে আধ্যাত্মচেতনার নতুন দিক। মিশ্রকলাবৃত্ত ছন্দের ধীরলয় এ কবিতার শব্দগুলিকে মন্ত্রে উত্তীর্ণ করে। পুনরুক্তির মন্ত্র আধ্যাত্মভাবনায় নতুন আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

এরপরে আসি 'নীল আকাশ' কাব্যগ্রন্থের 'মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যু' কবিতাটির কথায়। এই কবিতাটি পাঠ করলে স্পষ্ট বোঝা যায় মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যু উপলক্ষে কবিতাটি রচিত। অদ্ভুত Style ব্যবহার করে এ কবিতায় অচিন্ত্যকুমার শেষ পর্যন্ত ভারতীয় আধ্যাত্মসাধনা ও ঈশ্বর উপলব্ধিকে বড় করে তুললেন। তাঁর মৃত্যু কবিকে ব্যথিত করেছিল। তাই এক দেবকল্প মহামানবের মৃত্যুর সঙ্গে কবি এই মৃত্যুর ঘটনাকে মেলাতে চেয়েছেন। ওই দেবকল্প মহামানবের যে ভাবনা তিনি কবিতায় এনেছেন সেখানে পাঠক বুঝতে পারে তিনি হলেন যিশুখ্রীষ্ট। তিনি বললেন এই মৃত্যু ঈশ্বরের ইচ্ছায় ঘটেছে। তখনো সেই মৃত্যু ঈশ্বরের ইচ্ছায় ঘটেছিল। এভাবেই কবি প্রচ্ছন্নভাবে এ কবিতায় ভক্তিবাদের কথা শোনালেন আমাদের। মৃত্যু-দুর্দশা-মন্ত্র উচ্চারণ-সিদ্ধিলাভ এই চক্রচর কালের আবর্তনের মধ্য দিয়ে মৃত্যুর রূপকে দুর্দশাগ্রস্থ জাতির পরিত্রাণের রূপকে তুলে ধরলেন। মন্ত্র উচ্চারণের পবিত্র স্ফুটনের রূপকে এবং সিদ্ধিলাভের নতুন অনুভূতির রূপকে এ কবিতার আঙ্গিকে গোপনে এঁকে দিলেন আধ্যাত্মবাদের এক নতুন পথ।

এ তো গেল ভাব ও ব্যঞ্জনার বিষয়। এই ভিতের উপর দাঁড়িয়ে এ কবিতার শৈলীভাবনা, বিচার বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া আরো একধাপ এগিয়ে যায়। আটটি অসম পংক্তি বিন্যাসে রচিত গদ্যছন্দের Style-এ, এ কবিতায় বিভিন্ন ভাবকে স্থান দিলেন কবি। একস্থানে তিনি বলেছেন,

'তুচ্ছ তৃণ খন্ড নড়ে না ঈশ্বরের ইচ্ছা ছাড়া
বৃন্তচ্যুত হয় না সামান্য জীর্ণপত্র।'

এখানে তিনি উপমা অলংকারের প্রয়োগ ঘটিয়ে ঈশ্বরের অস্তিত্ব ঘোষণা করলেন। গান্ধীজীর মৃত্যু উপলক্ষে লেখা এই কবিতার ছত্রে ছত্রে বেজে উঠলো আধ্যাত্মবাদের জয়ধ্বনি। আবার তিনি বললেন—

> ‘যোগ সিংহাসন ছেড়ে মহাপ্রয়াণ করবেন কি
> মহাযোগী মহারাজ—’

এই দীর্ঘ হাইফেন পাঠককে দীর্ঘসময় বিরতি নিতে বলে এবং ভাবনায় জ্ঞাপিত হয় ঈশ্বরভাবনার নানান দিক।

এখন আসা যাক ‘আজন্ম সুরভি’ কাব্যগ্রন্থের কথায়। ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত এই কাব্যে কবির জীবনদৃষ্টি আরও বদলে গেল। তিনি ফিরে এলেন মূলাঙ্কের পথে। তাকালেন প্রাচীন ভারতবর্ষের সনাতন ঐতিহ্যের দিকে। বস্তুজগত থেকে ভাবজগতে। সেখানে উত্তরণের একমাত্র পথ ঈশ্বরানুভূতির সঙ্গলাভ। এই কাব্য সম্পর্কে এক আধুনিক সমালোচক সুদীপ্তা চক্রবর্তী আমাদের জানাচ্ছেন,

> “‘আজন্ম সুরভি’ থেকে অচিন্ত্যকুমারের উপলব্ধির জগতে পাঠান্তর ঘটেছে বলা যায়। এই সময়কালেই কবি অনায়াসে লিখে চলেছেন ধর্মগুরুদের জীবনভাষ্য। কবি তত্ত্বভাবনাকে কাব্যরূপ দেবারও অঙ্গীকার করেছেন আন্তরিক তাগিদেই—তিনি সনাতনীকে দেখেছেন প্রথম তৃপ্তিতে, স্থূলে ঘনীভূত হয়ে থাকতে চেয়েছেন, তারপর লক্ষ্য করেছেন দেহ নয়, প্রাণ,” (৬)

এখানে ‘অমাবস্যা’ কাব্যের আত্মধিক্কার নেই, আছে আত্মউন্মোচন। এখানে প্রেমের মাহাত্ম্য ও তাৎপর্য ভিন্নভাবে পরিবেশিত হয়েছে। কিছুটা তত্ত্বাকারে ও আধ্যাত্মিক ভাবনায়।

প্রথমেই বলা যাক এ কাব্যের ‘মন্ত্র’ কবিতার কথা। কবিতাটি দুটি পংক্তিতে বিন্যস্ত একটি অনু কবিতা। সাংকেতিক ভাষায় এ কবিতার ঈশ্বরভাবনা আকাশ ছুঁয়েছে। মিশ্রকলাবৃত্ত ছন্দের ধীর লয় ‘মন্ত্র’- এই নামকরণকে ব্যঞ্জিত করেছে। কবিতাটির প্রথম পঙক্তিতে কবি বলেছেন ‘শুধু এক মন্ত্র আছে, নাম তার অভী’ এই বাক্যের অন্বয়গত বিন্যাস বাংলা বাক্য গঠনের সাধারণ রীতি মেনে হয়নি। অতএব গঠনে দেখা গেছে আন্বয়িক বিচ্যুতি। তার ফলে বাক্যের ভাগগত অর্থের বদল ঘটেছে। বাক্যটির দুটি অংশ। প্রথম অংশে রয়েছে ‘শুধু এক মন্ত্র আছে’ এবং দ্বিতীয় অংশে রয়েছে ‘নাম তার অভী’। কার্যকারণ সূত্রে দুটি অংশ পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। এর মধ্য দিয়ে জ্ঞাপনের তত্ত্বে উঠে আসে ‘মন্ত্র’ নামক পথ দিয়ে অভয়ের কাছে পৌঁছানোর রাস্তা। যেখানে পৌঁছে গেলে বস্তুজগতের সমস্ত ভয় লীন হয়ে যায়। তখনই ঘটে ঈশ্বর উপলব্ধি। দ্বিতীয় পংক্তিতে কবি বলেছেন, ‘শুধু এক গন্ধ আছে আধ্যাত্ম্য সুরভি’। এখানেও বাংলা বাক্যের স্বাভাবিক আন্বয়িক ক্রম লঙ্ঘিত হয়েছে। এসেছে অন্বয়গত বিচ্যুতি। যার ফলে কবিতার নান্দনিক আবেদন আরো সাংকেতিক হয়ে উঠেছে এখানে।

আরো গভীরে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এই দুটি পংক্তির গঠন প্রায় একই রকমের। ভাষাবিজ্ঞানের তথা শৈলীর বিচারে গঠনের এই Repetition-কে ‘সমান্তরালতা’ বলে। এই ইশারা আধ্যাত্মবাদের। যেখানে ঈশ্বর উপলব্ধি ছাড়া পৌঁছানো সম্ভব নয়। আর পৌছে গেলে যে রসানুভূতির জন্ম হয় সেখান থেকে কবি বলে ওঠেন,

> ‘উমা আর অমা
> এই দুই পরমের সীমা

মেলাও অস্তিত্বের দুই মেরুতে।'

(মধুসূদনকে, অন্তর্বর্তী কবিতা)

এ যেন এক মৌক্তিক উন্মোচন।

'আজন্ম সুরভি' কাব্যগ্রন্থের আরও একটি কবিতা হল 'ত্রিনেত্র'। এই কবিতাতেও আমরা দেখব কাব্যশৈলী বিচারের মধ্য দিয়ে সেখানে কিভাবে ঈশ্বরভাবনা প্রকাশিত হয়েছে। এখানে তিনি রোম্যান্টিক চেতনাকে পাশ কাটিয়ে নতুন এক আত্মউন্মোচনে নিজেকে নিয়োজিত করলেন। যাকে দেখতে হবে তৃতীয় নয়ন দিয়ে। যেখানে এসে পৌঁছালে শরীর থেকে মুছে যায় সব বন্ধনের চিহ্ন। সেখানে পৌঁছাতে পারলে সমস্ত অনুভূতি রূপান্তরিত হয়ে যাবে স্ফূর্তিতে। বাজতে থাকবে এক নতুন ছন্দের লহরী। সে লহরীতে মুক্ত প্রাণের জয়গান ঘোষিত হয়। যেন চৈতন্যে উত্তরণ ঘটেছে। যন্ত্রণা হয়ে যায় প্রার্থনা। আত্মার মরণ নেই বলেই কবিকে বলতে হয় 'আত্মার রমণ'। এই অবিচ্ছেদ্য যাত্রাপথ দিয়েই এই বৈপরীত্য শৈলীবোধ নিয়ে নিখিলের সঙ্গে মিলন সম্ভব। তখন 'দেহ' নামক এই পার্থিব বস্তুজগত পরিবর্তিত হয়ে নতুন মন্ময় জগতে পৌঁছে যায়। ঘটে ঈশ্বর উপলব্ধি। সেই কথাই ব্যঞ্জিত আকারে 'ত্রিনেত্র' এই শব্দগুচ্ছের প্রয়োগ ঘটিয়ে কবিতার নামকরণকে নতুন এক অর্থভাবনায় প্রকাশ করলেন কবি।

কবিতাটির পঙক্তি সংখ্যা বারোটি। তিনটি স্তবকে বিন্যস্ত চারটি করে অসম দৈর্ঘ্যের পঙক্তি বিন্যাস গদ্যছন্দের ধীর লয়কে বুকে নিয়ে কবিতাটির ভাষিক আবেদনকে আরো সূক্ষ্ম করে তুলেছে। না পাওয়ার যন্ত্রণা যেমন আছে, তেমনই আছে বিরাটের পায়ের তলায় ক্ষুদ্রের সবিনয় প্রার্থনা। যে প্রার্থনায় উন্নীত হলে আধাত্ম্যরসের উপলব্ধি সম্ভব হয়। তখন চেতনা, জাগরণের স্তরে পৌঁছে পার্থিব বস্তুজগতকে মিথ্যা করে দেয়। মনে হয় বিন্দুই সিন্ধু দর্শনের সমতুল্য। সেই উপলব্ধির জগতকে ব্যাখ্যা করার জন্য তৃতীয় নয়নের আবশ্যক হয়ে পড়ে। কবিতাটির শব্দ ব্যবহার ও ভাষিক আবেদন সেই কথাটিকে ব্যক্ত করতে চায়।

এরপর অচিন্ত্যকুমারের কবিতা রচনায় স্থান পেল একাধিক মহাপুরুষ ও সাধক সাধিকা। সময়টা তখন ১৩৭২ বঙ্গাব্দ। মহাপুরুষ ও সাধক-সাধিকাদের জীবনকথা এই পর্বে তাঁর মন অধিকার করেছিল। এই পর্বের প্রথম কবিতার নাম 'শ্রীরামকৃষ্ণ'। কবিতাটির নামকরণের চেতনায় ভেসে আসে অপার এক ভক্তিবাদের মহিমা। চারটি পঙক্তির সমন্বয়ে এ কবিতায় তিনি দেখালেন জীবন যখন তৃষ্ণাকাতর হয়ে পড়ে, যখন জীবন সম্পর্কে বীততৃষ্ণ ভাব অনুভূত হয়, তখন আমাদের ফিরে যেতে হয় ঈশ্বরের কাছে। একস্থানে তিনি বললেন 'স্মরণ করো শরণালয় ঠাকুর রামকৃষ্ণ'- এই অংশের শব্দচয়ন, ভাষিক আবেদন এক নতুন কাব্যিক Style নির্মাণ করেছে। বলতে চেয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ যেন সমস্ত বাক্যের ব্যাখ্যা, যেন সমস্ত কর্মের মূল কর্ম। যেন সমস্ত সাধনার সারস্বত প্রতিভূ। সেখানেই শেষ আশ্রয় নিতে হবে আমাদের। চারটি পঙক্তির সমাবেশে, কার্যকারণ সূত্রের রীতিতে, সম্বোধনের শৈলীতে এ কবিতার ভাব চূড়ান্ত ঈশ্বর উপলব্ধির জায়গায় পৌঁছে গেছে। সমগ্র কবিতায় একটিমাত্র সমাপিকা ক্রিয়াপদ 'কোরো' শুধুমাত্র বিবৃতিমূলক হয়ে থাকেনি, তা পৌঁছে গেছে বোধের কাছাকাছি। যেখানে ব্যক্ত হয়েছে শেষ পর্যন্ত ঈশ্বর উপলব্ধি। উৎপ্রেক্ষা অলংকারের গভীরেও বেজে উঠেছে আধ্যাত্মবাদের শঙ্খ ধ্বনি।

এরপর এই পর্বের একটি কবিতা 'জ্যামিতি', যেখানে তিনি ছকভাঙা পথে বলেছেন কুলকুণ্ডলিনীর কথা। সাধারণ জ্যামিতি বললে আমাদের মনের চরাচরে ভেসে ওঠে বিভিন্ন ছকের কথা। সেখানে ভক্তি ভাব নৈব নৈব চ। কিন্তু এখানে যে নতুন জ্যামিতির ছক তৈরি হল তার মধ্য দিয়ে আমাদের ভক্তিভাব জাগ্রত হয়। সেই

চেনাপথে অচিন্ত্যকুমারের ঈশ্বরানুভূতি ঘটেনি। ঘটেছে অন্য পথে, অন্য ভাবনায়। এ কবিতায় সেই কথাই বলা হয়েছে। সত্তার গভীরে লুকিয়ে আছে যে মা কুণ্ডলিনীর অস্তিত্ব, তার কাছে পৌঁছাতে হলে চিরপরিচিত পথ ধরে পৌঁছানো সম্ভব নয়। ভাঙতে হবে ছককে, নির্মাণ করতে হবে নতুন পথের জ্যামিতি। সেই নবনির্মিত জ্যামিতি দিয়েই উপলব্ধি হবে ভক্তিভাব তথা ঈশ্বরানুভূতি। চেতনায় জেগে উঠবে আধ্যাত্মরসের স্ফুরণ। কবিতাটির নামকরণে সেই ব্যঞ্জনাই ধরা পড়েছে।

কবিতাটির প্রথমেই কবি বলেছেন 'অদেখা হয়েও তুমি অগাধের চেনা।' এই বাক্যটির মধ্যে লুকিয়ে আছে Identity ইবং Contrast এর তত্ত্ব। সাধারণভাবে আমরা জানি অদেখা থাকলে কখনোই চেনা বা পরিচিতি হওয়া সম্ভব নয়। কারণ অদেখার কাজ অচেনা। এখানে ঘটেছে বিপরীত ঘটনা। কারণ অনুযায়ী কার্য এখানে ঘটছে না। অর্থাৎ বিষম অলংকারের প্রয়োগ ঘটেছে। সমালোচক লিচ (Leach) এই ব্যাপারটিকে 'Contrast' বলেছেন। কেউ কোনদিন ঈশ্বর দেখেনি। চাক্ষুষ দেখার বাইরেও রয়েছে তার প্রতি এক অফুরন্ত টান। আসলে মানুষের এ যেন নিজের অস্তিত্বের দিকে ফিরে চলা। এজন্যই এই টান উপলব্ধি হয়। এখানে ঈশ্বর উপলব্ধির বিষয়টি ভাবনায় এসেছে। এই structural Repetition এর মধ্যে তৈরি হয়েছে Contrast। এই উদ্ধৃতাংশটি বৈপরীত্যের আধারে নির্মিত। কার্যকারণ সূত্রে ভাবের বৈপরীত্য থাকলেও, বাক্যের অন্বয়গত স্তরে একাধিক বাক্যাংশ বা বাক্য একটি বাক্যাংশকে আশ্রয় করে নির্মিত হয়েছে। ভাবের বৈপরীত্য আমাদেরকে নিয়ে গেছে ঈশ্বরভাবনার অনুভূতিতে। কুলকুণ্ডলিনী যা আমাদের সত্তার গভীরে লুকিয়ে থাকা এক চেতনা, তাঁর সন্ধান পাই আমরা। ঘটে জাগৃতি, ঘটে চেতনা থেকে চৈতন্য উত্তরণ, তৈরি হয় নতুন জীবন ছক। একেই কবি জ্যামিতি বলেছেন।

অচিন্ত্যকুমারের 'সমগ্র কবিতা' গ্রন্থের 'পরবর্তী কবিতা' পর্বের প্রথম কবিতার নাম 'মাতৃস্তোত্র'। এই কবিতার কেন্দ্রীয় বিষয়ে ভক্তি। এছাড়াও এখানে ধ্যান ও ভগবত চিন্তা বড় হয়ে উঠেছে। কারণ তিনি উপলব্ধি করেছেন মাতৃচরণ হল একমাত্র সত্য, যেখানে সমস্ত রকম ভোগের পরিনাম সীমা উত্তীর্ণ হয়ে ঘটে মোহমুক্তি। যেখানে পৌঁছে গেলে সমস্ত কিছুর সন্ধান উপলব্ধি হয় এবং মোহমুক্তি ঘটে। শরীর থেকে খুলে যাবে সমস্ত বন্ধনের চিহ্ন। কিন্তু দেখবো বললেই তো আর মাতৃরূপ দেখা যায় না, তা যেন 'অনাত্মপ্রত্যয়রূপা অবিদ্যা'।

দীর্ঘ এই কবিতার পংক্তি সংখ্যা ১২২টি। ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে লেখা এই কবিতায় বড় হয়ে উঠল ভক্তিবাদ। মিশ্রকলাবৃত্ত ছন্দের দোলায় এ কবিতার আবেদন আরও জোরালো ভাবে স্থায়িত্ব পেয়েছে পাঠকের মনে। এ কবিতায় একাধিক পুনরুক্তি ও সমান্তরালতার গঠন দেখা গেছে। যেমন এক স্থানে কবি বলেছেন, 'তুমি নিত্যস্ততা যেহেতু তুমি সর্বভূতা, স্বর্গমুক্তি বিধাত্রী' এই পংক্তিটির তিনটি অংশ। সেগুলি হল,

১) 'তুমি নিত্যস্ততা'
২) 'যেহেতু তুমি সর্বভূতা'
৩) 'স্বর্গমুক্তি বিধাত্রী'

প্রত্যেক অংশের শুরুতে কর্তা বর্তমান রয়েছে। কিন্তু তৃতীয় অংশটিতে কর্তা উহ্য রয়েছ। এখানে আমরা যদি বাক্য গঠনের অধোগঠনের স্তরে পৌঁছাই তাহলে দেখব সেখানে কর্তা ছিল কিন্তু কর্তার বিলোপন ঘটেছে এবং দ্বিতীয় অংশে 'যেহেতু' এই অব্যয়ের সংযোজন ঘটেছে। সংবর্তনের এই দুই বিষয়টি না থাকলে তিনটি বাক্যেরই অধোগঠনের রূপ একই ছিল। যেমন,

অধোগঠন		***অধিগঠন***
১) 'তুমি নিত্যস্তুতা'	>	'তুমি নিত্যস্তুতা'
২) 'যেহেতু তুমি সর্বভূতা'	>	'তুমি সর্বভূতা'
৩) 'তুমি স্বর্গ মুক্তি বিধাত্রী'	>	'স্বর্গমুক্তি বিধাত্রী'

অর্থাৎ আমরা দেখলাম বাক্যের অধোগঠনের স্তরে পুনরুক্তি ঘটেছে। যা অধিগঠনে এসে কবিতার ভাষ্যে স্বতন্ত্র অর্থ বহন করেছে। আমরা বলতে পারি পুনরুক্তির ব্যবহার যদি স্বতন্ত্র তাৎপর্য বয়ে না আনে, তাহলে তা কবিতার পক্ষে বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। অপ্রয়োজনে পুনরুক্তির ব্যবহার একঘেয়ে এবং ক্লান্তিকর হয়ে পড়ে। এখানে স্বতন্ত্রভাবে 'পুনরুক্তি' কুলুকুণ্ডলিনী মায়ের বিচিত্র রূপের ও বিচিত্র ভক্তির সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়েছে এবং বিশ্বজননীকে মাতৃরূপে কল্পনা করেছেন। মেতে উঠেছেন মান অভিমানের খেলায়।

এখানে সমান্তরালতার একাধিক দৃষ্টান্ত কবিতাকে আরো আকর্ষণমুখী করে তুলেছে। ফলে ঈশ্বরানুভূতির বার বার আবর্তন পাঠকের মনোগঠনকে অন্যভাবে নির্মাণ করেছে বলা যায়। বলেছেন—

> 'তোমাকে বুঝিনি বলেই তো আমি দীন
> তোমাকে পাইনি বলেই তো আমি আর্ত।'

এখানে সমান্তরালতার মাধ্যমে Structural Repetition এর সৃষ্টি হয়েছে। পুনরুক্তির ব্যবহার ঘটেনি। সমান্তরালতার গঠনে সাদৃশ্য ও সাম্য থাকলেও, ভাবজ্ঞাপনে এসেছে বৈপরীত্য। এই বৈপরীত্যের মধ্য দিয়ে তৈরি হয়েছে ব্যঞ্জনার অভিঘাত। যা শ্রোতা ও পাঠকের মনোযোগকে আরো ভক্তিবাদের দিকে নিয়ে গেছে। বিশ্বজননীকে স্বচক্ষে দেখতে না পেয়েও তাঁকে মাতৃরূপে কল্পনা এবং মাতৃচরণে লীন হওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে কবি এ কবিতার শৈলীভাবনাকে আরও প্রসারিত করলেন ভক্তিবাদের মন্ত্রে।

এবার তিনি প্রবেশ করলেন 'উত্তরায়ণ' কাব্যে। নিরপেক্ষ বিচারে এটি কবির শেষ কাব্যগ্রন্থ। এই কাব্যের বিভিন্ন কবিতায় দেখা গেল ঈশ্বরবিশ্বাস ও দিব্যজীবনের প্রতি কবির আকুতি যেন প্রবল থেকে প্রবলতর হয়েছে। এ প্রসঙ্গে শংকরীপ্রসাদ বসু বলেছেন—

> 'অচিন্ত্যকুমারের কবিজীবনের উপান্ত পর্বে মরমীবোধ এবং শরীরী বাসনার দ্বন্দ্ব হঠাৎ উদ্ধারিত হয়ে গেছে। মরমীবোধে অচিন্ত্যকুমার উত্তীর্ণ হয়েছিলেন একদিনে নয়— ক্রমশ কিন্তু অচিন্ত্যকুমারের ব্যক্তি স্বভাবের সততা ও দৃঢ়তা যেমন সব পর্যায়ে তেমনি অন্তর্পর্বেও ঈশ্বরবিশ্বাস কবির একালের কবিতার কেন্দ্রীয় সুর।' (৭)

এই অভিজ্ঞতার নজির 'উত্তরায়ণ' কাব্যের যত্রতত্র ছড়িয়ে আছে।

প্রথমেই বলি এ কাব্যের 'জনসাধারণ' কবিতাটির কথা। এই কবিতাটিতে কবি তুলে ধরেছেন ঈশ্বরবিষয়ক আলোচনায় রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের কথোপকথন। শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দকে অনিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য মহিমা, ঈশিতা, বশিতা, এবং কামতৃপ্তি- এই অষ্টসিদ্ধি লাভের কথা বলেছিলেন। কিন্তু নরেন তাকে নস্যাৎ করে দিয়ে বলেছেন 'চাই বাস্তব জীবিত সত্য ঈশ্বরদর্শন'। এই ঈশ্বরানুভূতিতে নরেনের প্রতি আস্থা রেখেছেন কবি শেষ পর্যন্ত। আর রামকৃষ্ণ উপলব্ধি করেছেন অন্য এক ঈশ্বরানুভূতির জীবন্ত সত্তা। যেখানে জীবপ্রেমই ঈশ্বর প্রেমের রূপান্তর হয়ে দেখা দিয়েছে।

কবিতাটিতে দুটি স্তবকে অসম পংক্তিবিন্যাস নিয়ে একটা কথোপকথনের শৈলীভাবনা ফুটে উঠেছে। এই শৈলীভাবনার গভীরে নিহিত রয়েছে ঈশ্বরদর্শনের অনুভূতি। যা লাভ করলে অবিশ্বাস্য ক্ষমতার অধিকারী হওয়া যাবে এবং বিচিত্র অলৌকিক কান্ড কারখানা ঘটানো যাবে। কবির কথায়,

'সবারে দেখাবি যত অবিশ্বাস্য কান্ড অলৌকিক
যতসব ভোজবাজী ভেল্কিবাজী বিচিত্র ম্যাজিক।'

উপরের পংক্তিদুটিতে মনে হবে দুটি বাক্য রয়েছে। কিন্তু ভাবনার অন্তরে লুকিয়ে রয়েছে একাধিক বাক্যের গঠন। যেমন—

১) 'সবারে দেখাবি যত অবিশ্বাস্য কান্ড'
২) 'সবারে দেখাবি যত অবিশ্বাস্য অলৌকিক বিষয়'
৩) 'সবার দেখাবি যতসব ভোজবাজী'
৪) 'সবারে দেখাবি যত ভেল্কিবাজী'
৫) 'সবারে দেখাবি যতো বিচিত্র ম্যাজিক'

কবিতায় প্রকাশিত পংক্তি দুটি হল এই বাক্যগুলির অধোগঠনের রূপ থেকে অধিগঠনের স্তরে পৌঁছে যাওয়ার গঠন এবং শৈলীর কারসাজি। পরিবর্তিত রূপ এককথায় অধিগঠনের রূপ। অধোগঠনের স্তরে সাধিত হয়েছে একটা Structural Repetition। ইহা সমান্তরালতার ধর্ম পালন করেছে। এই বিশেষ ভঙ্গি কবিতায় তৈরি করেছে একটি সাংগীতিক আবেদন। এই আবেদনকে অস্বীকার করলেন নরেন। তাঁর কাছে ঈশ্বরদর্শন হল- 'সে ঈশ্বর আমি তুমি আপামর জনসাধারণ'। একটা বিরুদ্ধচারণের শৈলী এখানে গঠিত হয়েছে। কবির ঈশ্বরউপলব্ধি হয়েছে আরো তীব্র, তীক্ষ্ণ। এছাড়াও শব্দ প্রয়োগে কবির মৌলিকতা লক্ষ্য করার মতো। একাধিক বিচ্যুতি কবিতার ভাষাকে করে তুলেছে আরো বেশি সাংকেতিক। কবিতার মধ্যে একধরনের ধ্বনিমাধুর্য সৃষ্টি হয়েছে। 'জনসাধারণ' এই চিত্রকল্পে শব্দ ও ধ্বনির পারস্পরিক নির্ভরতার যে ব্যঞ্জনা তৈরি হয়েছে সেখানে ঈশ্বরপোলব্ধির অর্থ গেছে বদলে।

'সে এক আশ্চর্য দিন' কবিতাটিতে তত্ত্বরূপ, কাব্যরূপে পরিবর্তিত হয়েছে। ভারতের স্বাধীনতা লাভের দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য এ কবিতার সৃষ্টি। ব্রিটিশ শাসনের শোষণ থেকে যে ভারতের মুক্তিলাভ সম্ভব হল তার ঠিকানা, তার গতিপথ, তার আদর্শ, তার গুরু, তার চালিত শক্তি কে হবে? তখনই কবি আস্থা রাখলেন ভারতীয় প্রাচীন আধ্যাত্ম্য প্রসঙ্গের উপর। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন নতুন ভারতের মুক্তিলাভ ঘটবে ভক্তিবাদের আলোয় আলোয়। সচ্চিদানন্দের শক্তি ভারতের ঐতিহ্যকে পাহারা দেবে, আর বদ্ধ কারাগারে বসে বাসুদেব আঁকবেন এ পৃথিবীর রেখাচিত্রে মানুষের মনচিত্রকে। তাই কবি আমাদের জানালেন 'সর্বত্র কৃষ্ণের মূর্তি করে ঝলমল'। এ কবিতায় মুক্তির শৈলীভাবনাকে বলতে গিয়ে এসেছে একাধিক বিচ্যুতি। সরল কলাবৃত্তের প্রয়োগ এবং বিভিন্ন চিত্রকল্পের সাংকেতিক ভাবনা কবিতার গঠনশৈলীকে নির্মাণ করেছে। পূর্বের কবিতার আলোচনায় কবি দেখিয়েছিলেন নরেনের ভাবনায় উঠে এসেছিল মানুষের ঈশ্বর হওয়ার প্রসঙ্গ। আর এখানে কবি দেখালেন,

'ঈশ্বর মানুষ হল
এবার মানুষ ঈশ্বর হবে

ভগবতী চেতনায় নবীভূত বিশুদ্ধ বিগ্রহ
মানবতা'

এই অংশের অন্বয়গত বিচ্যুতি লক্ষ্য করার মতো। এই বিচ্যুতি কবিতার ভাবনাকে আরো তীক্ষ্ণ করে তুলেছে। এই তীক্ষ্ণ ভাবনা আধ্যাত্মবাদকে মনে করিয়ে দেয়। যে আধ্যাত্মবাদ চূড়ান্ত ঈশ্বরানুভূতির প্রসঙ্গকে এ কবিতার প্রাণকেন্দ্রে হাজির করেছে বলা যায়।

এই কাব্যগ্রন্থের আরেকটি কবিতা 'দেহমন'। এই কবিতায় কবি নিজেকে ঈশ্বর ভেবেছেন বা ঈশ্বরের রেফারেন্সে নিজেকে উপস্থাপিত করেছেন। সতেরোটি পংক্তিতে বিন্যস্ত এই কবিতায় মিশ্রকলাবৃত্ত ছন্দের ধীর লয় কবিতাটিতে একটা ভক্তি ও আত্মবিশ্বাসের প্রসঙ্গ নির্মাণ করেছে। এই কবিতার কয়েকটি পঙক্তির বিন্যাসে যদি ঢুকে পড়ি তাহলে দেখব—

১) 'কোন পুণ্যে পেয়েছি মানব দেহ'
২) 'কোন মূল্যে অনন্তের দিব্য আয়তন'
৩) 'কোন মন্ত্রে পেয়েছি মানবপ্রাণ'

উপরের তিনটি পংক্তিতেই ব্যবহৃত হয়েছে সমগঠন। এই Structural Repetition কে শৈলীর পরিভাষায় বলে 'সমান্তরালতা'। পংক্তিগুলির মধ্য দিয়ে প্রশ্ন উত্তরের ভঙ্গিতে তৈরি হয়েছে একটি বিশেষ শৈলী। কবিতার অন্তর থেকে উঠে এসেছে একটা 'সাংগীতিক প্রতিভাসের' আবেদন। এই উত্তরদান, এই উপলব্ধি কবিতাটিকে গতিশীল করে তুলেছে। এসেছে চাঞ্চল্য। অধীর আগ্রহে অপেক্ষারত কোন ভক্ত যেন দেহমন লীন করে পরমাত্মার উপলব্ধিতে অপেক্ষারত। কবি এক অসাধারণ শৈলী ব্যবহার করে কবিতার এই গতিকে রুদ্ধ করে দিলেন। একটি ক্রিয়াপদ 'পেয়েছি' এবং এর সঙ্গে যুক্ত করলেন 'মানবমন' শব্দটি। তখন এই শব্দটি আভিধানিক অর্থ ছাড়িয়ে, চিত্তের গণ্ডি পেরিয়ে পৌঁছে গেল চিত্রকল্পে। যার নান্দনিক আবেদনে এই কবিতার শৈলীভাবনা আধ্যাত্ম্যরসকে কেন্দ্র করে আকাশ ছুঁয়েছে।

এই পর্বে আমরা তাঁর আধ্যাত্মিক ভাবনামূলক কবিতার শৈলীবিচার করে দেখতে পেলাম, তিনি যত বেশি ঈশ্বরমুখী হয়েছেন, ততই তাঁর কবিতার তত্ত্ব ভক্তিতে, আধ্যাত্মিক রসে নিষিক্ত হয়েছে। তাঁর এই পর্বের কবিতার কাব্যশৈলী একান্তভাবে তাঁরই। টেকনিকে, বাচনিকতায় তাঁর সিদ্ধি প্রশ্নাতীত। 'কল্লোলে'র অন্যতম প্রাণপুরুষ অচিন্ত্যকুমারের কাব্যে স্বতন্ত্র এক শিল্প আঙ্গিকের লক্ষণ আমরা সুস্পষ্টভাবে দেখতে পেলাম। একটা যুগসংকটের বৃত্ত থেকে মুক্তির জন্য তিনি কবিতায় ভক্তিমুখী বক্তব্য উপস্থাপনের চেষ্টায় রত হলেন। এই চেষ্টা তাঁকে যেমন 'কল্লোল' গোষ্ঠী থেকে দূরবর্তী স্থানে সরিয়ে দিয়েছিল আবার তেমন করেই তিনি হয়ে গিয়েছিলেন এক নিঃসঙ্গ পথের পথিক। সেই পথেই অচিন্ত্যকুমারের জীবনতত্ত্ব হয়েছে ভক্তিতত্ত্বে রূপায়িত।

তথ্যসূত্র:

১. 'কবি শ্রীরামকৃষ্ণ', 'অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের শতবার্ষিকী সংকলন', মিত্র ও ঘোষ, কোল-৭৩, মুদ্রণ-১৪২৬ জৈষ্ঠ্য, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৩৫১
২. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৩৫০
৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, 'অচিন্ত্যকুমার', কথাসাহিত্য পত্রিকা: অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত জন্ম শতবর্ষ সংখ্যা, কোল-০৯, মুদ্রণ-মাঘ ১৪১০, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৪
৪. বিশী, প্রমথনাথ, 'অচিন্ত্যকুমারের অমাবস্যা কাব্য', 'কথাসাহিত্য: অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের জন্মশতবর্ষ সংখ্যা', কোল-০৯, মুদ্রণ- মাঘ ১৪১০, পৃষ্ঠা সংখ্যা-২২
৫. দাশ, শিশিরকুমার, 'পুনরুক্তি', 'কবিতার মিল ও আমিল', দে'জ, মুদ্রণ- আগস্ট ১৯৯৬, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৩৫
৬. চক্রবর্তী, সুদীপ্তা, 'অচিন্ত্যকুমারের কবিতায় ঈশ্বর ভাবনা' ,'অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত: কবি ও কথাশিল্পী', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা-০৯, মুদ্রণ-পয়লা বৈশাখ ১৪২০, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৪৩
৭. 'মঙ্গল কবি', 'কথাসাহিত্য পত্রিকা: অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত জন্মশতবর্ষ সংখ্যা', মাঘ ১৪১০, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৭১